প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা

ড. মৃণাল কান্তি দাস

অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! কয়েক হাজার বছর আগে যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অন্ধকারের আবরণে আবৃত, তখন ভারত জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখাটি প্রজ্জ্বলিত করে সেই অন্ধকারের বুক চিরে চিহ্নিত করে দিয়েছিল মানব সভ্যতার চলার পথ। অথচ কয়েক হাজার বছর পরে সেই প্রদীপ্তশিখার প্রজ্জ্বলনকারী ভারত ইউরোপ–প্রদত্ত বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হওয়ার প্রত্যাশী। শুধু প্রত্যাশীই নয়, ইউরোপীয় বিজ্ঞান-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই আজ ভারত হয়েছে আধুনিক সভ্যতার আলোকদীপ্ত পথের পথযাত্রী। প্রাচীন ভারত বিজ্ঞান-চিন্তায় বিশেষ অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববাসীর কাছে বিস্মৃতই থেকে গেছে, তারই প্রমাণ আছে প্রাজ্ঞ ফ্যারিংটন রচিত প্রাচীন যুগের বিজ্ঞান সম্পর্কিত ইতিহাস গ্রন্থে। এ গ্রন্থে পন্ডিত ফ্যারিংটন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোমের বিজ্ঞান-চর্চার বিষয় আলোচনা করলেও আশ্চর্যের কথা ভারতের বিজ্ঞান চিন্তার কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করেন নি। এতে একদিকে যেমন পণ্ডিত ফ্যারিংটনের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই প্রকাশিত অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতের পরিচয়ের অভাবও সূচিত। প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানের সার্থক সমুন্নতি ঘটা সত্ত্বেও দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা অতিরিক্ত প্রাধান্য অর্জন করাতেই দেখা দিয়েছে এই বিভ্রান্তি।

যুক্তিমূলক মনোবৃত্তি থেকেই বিজ্ঞানের উদ্ভব। আর গ্রীস দেশেই প্রথম এই যুক্তিমূলক মনোবৃত্তির জন্ম বলে পাশ্চত্য পণ্ডিতদের ধারণা। বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকেও এর মূল্য অধিক। এই মূল্যবান মনোবৃত্তির তুলনায় ভারতের প্রচলিত সংকীর্ণ সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীলতা, উদ্ভট কল্পনার দ্বারা প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা, অলৌকিক কাহিনী ও যুক্তিহীন ধর্মমতের প্রবল প্রভাব ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে ভারতকে অনগ্রসর, অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলেই পরিচিত করেছে। কিন্তু স্মরণে রাখা দরকার যে এক দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে অন্যদেশের নিকৃষ্ট বস্তুর তুলনা করলে তা হয় সত্যের অপলাপ, যুক্তি ও বুদ্ধির অপপ্রয়োগ। ভারত সম্পর্কে তুলনাটি এই দোষেই দুষ্ট।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক বিজ্ঞানের উদ্ভব আর পঞ্চম শতাব্দীতে তার স্বর্ণোজ্জ্বল বিকাশ। কিন্তু এই যুগেই গ্রীস দেশে প্রচলিত ছিল এলিট্যাসেনিয়ান ও অর্ফিক উৎসব যা কুসংস্কারের বেড়াজালে ছিল আবদ্ধ। এমনি আরও সব প্রথা যা অলৌকিকতা আশ্রয়ী। যে পঞ্চম শতাব্দীতে জ্ঞানের স্বর্ণপ্রদীপটি জ্বালিয়ে নিয়ে গ্রীস দেশ বিশ্বকে আলোর পথের ইশারা জানিয়েছে, সেই পঞ্চম শতাব্দীতেই মূল গ্রীস ভূখণ্ডই হয়ে উঠেছিল অন্ধ সংস্কারের কারাগার। এর জন্যই ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী পেরিপ্লিসের বন্ধু অ্যানাকসেগোরাস সূর্য ও চন্দ্রকে দেবতা নয় বলায় আদালতে অভিযুক্ত হন। অভিযুক্ত হতে হয় প্রোটোসেরাসকে। বিষপান করতে হয় সক্রেটিসকে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বুদ্ধি যে ছিল তা অনস্বীকার্য। ভারতে সিন্ধুনদের উপত্যকায় ও অন্যান্য স্থানে যে সব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তারই মধ্যে নিহিত আছে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বুদ্ধির পরিচয়। এখানে সোনা, রূপো, তামা, টিন, সীসে প্রভৃতি ধাতুর মিশ্রণে উৎপাদিত ব্রোঞ্জের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এতে প্রমাণ হয় ভারতীয়রা খনি থেকে ধাতু উদ্ধার ও তাকে কাজে লাগানোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে ছিল পরিচিত। নানা বর্ণে চিত্রিত কাচের মত মসৃণ বাসনপত্র দেখে মনে হয় রসায়ন শাস্ত্রে তাদের জ্ঞান ছিল গভীর, এঁরা সেরুসাইট (cerussite), হিঙ্গুল (cinnalear), শ্বেতসীসক (white lead), জিপসাম (gypsum), চুন প্রভৃতির ব্যবহারে ছিলেন অভ্যস্ত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে কোন গ্রন্থ পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু মুদ্রায় অপরিচিত অক্ষরে লিখিত ছোট ছোট লিপি পাওয়া গেছে, যা ভারতের অগ্রসরতারই সূচক।

ভারতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋক্‌বেদে যুক্তিমূলক মনোভাবের পরিচয় স্পষ্ট। দৃশ্যমান জগতের অন্ত র্নিহিত গূঢ় রহস্য জানবার আত্যন্তিক ও আন্তরিক আগ্রহ এবং কোন প্রকার সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে যুক্তির দ্বারা সেই রহস্য ভেদের চেষ্টা – এটিই হল বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা মনোবৃত্তি। ঋক্‌বেদের দশম মন্ডলের ১২৯ সূক্তে সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে এই প্রকার মনোবৃত্তির পরিচয় আছে। ঋক্‌বেদে প্রশ্ন আছে সৃষ্টির প্রারম্ভে কি ছিল ? এই পৃথিবীর উপর কিসের আবরণ ছিল ? কে একে আশ্রয় দিত ? অতল সীমাহীন জলশক্তিই কি ওকে ঢেকে রাখত ? তারপর এই সব প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না। মৃত্যুও ছিল না অমরত্বও ছিল না। দিনও ছিল না রাত্রিও ছিল না। নিবিড় অন্ধকারে সব ঢাকা ছিল। আর ছিল অনন্ত সলিল রাশি। সৃষ্টির বীজ ছিল লুকিয়ে। একদিন তাপ লেগে তা বেরিয়ে পড়ার ফলে সৃষ্টির আরম্ভ হল। প্রথমে ছিল কোনও একটি সত্তা, তা থেকেই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হল। তারপর হল দেবতাদের উৎপত্তি। গ্রীক দার্শনিক থেলস্ বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন ঋক্‌বেদে এই সূক্তের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বর্তমান। বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানবুদ্ধি ছিল যথেষ্ট প্রবল। কিন্তু কালক্রমে দর্শন ও আধ্যাত্ম জ্ঞানের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় এবং জ্ঞানের এই দুটো শাখা তুলনামূলকভাবে বেশী উন্নত হওয়ায় বিজ্ঞানবুদ্ধি অনেকখানি পরিমাণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

উজ্জ্বল অতীত তমসাবৃত হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। 'হিন্দু রসায়ন বিদ্যা' গ্রন্থে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বসে ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন 'কি ছিল, কি হইয়াছে। যে দেশে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন শবব্যবচ্ছেদ ভিন্ন চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা করা অসম্ভব', সেই দেশে শব স্পর্শ করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়া গেল। যে দেশে মনীষী ঢুন্টুকনাথ বলেছিলেন : 'যাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষার দ্বারা দেখাইতে পারেন তাহারাই প্রকৃত শিক্ষক। যে সকল ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে পরীক্ষাগুলি শিখিয়া নিজে নিজে সেইগুলি করিতে পারেন তাহারাই যথার্থ শিক্ষার্থী। সেই দেশের কবিরাজগণ শরীর বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন।' নিংসন্দেহে ভারত তার অতীত ঐতিহ্যের ধারাচ্যুত হয়ে পড়েছিল বলেই বিশ্বের কাছে তার উজ্জ্বল অতীত হয়ে পড়েছে তমসাবৃত।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার আলোচনার সূত্রপাত করতে হলে জ্যোতিষের উল্লেখ অপরিহার্য। সূর্য, চন্দ্র, তারা, প্রভৃতি দেবতা এবং তাদের গতিবিধি রহস্যাবৃত এই মতবাদ কাটিয়ে ঋক্‌বেদে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভে আকৃষ্ট হয়। এই সময় দ্বাদশ রাশিচিহ্ন ও সপ্তরশ্মির উল্লেখ পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে প্রাচীন পাঁচটি সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। আর্যভট্টের সময় জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা উন্নতি হয়। তিনি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা দ্বারা বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। এর মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান ও বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে স্বীকৃত। তিনিই প্রথম অবিষ্কার করেন যে পৃথিবী তার অক্ষের চারদিক ঘোরে। তিনিই প্রথম ত্রিকোণমিতির সাইন (sign) আবিষ্কার করেন এবং জ্যোতিষিক গণনায় প্রয়োগ করেন। তিনি পরপর ছদিনের দৈর্ঘ্যের ব্যবধান সঠিক নির্ণয় করার সূত্র (formula) নির্ধারণ করেন। তিনি অপ-পূরকের (apse) সাহায্যে গ্রহের কক্ষ (orbit) নির্ণয়ের বিশুদ্ধ সমীকরণ (equation) আবিষ্কার করেন। আর্যভট্ট কর্তৃক চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বিরোধী মত প্রচারের বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। গ্রীসে যেখানে বিরুদ্ধ মত প্রচার করে অভিযুক্ত হতে হত, সেখানে ভারতে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, গবেষণা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা লক্ষ্যণীয়। পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্তন সম্বন্ধে আর্যভট্টের মতের প্রতিধ্বনি করায় গ্যালিলিওকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল তা স্মরণ করলে এই সত্যই স্বীকার করতে হয় যে আর্যভট্টের যুগের ভারতবর্ষ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নততর বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অধিকারী ছিল। আর্যভট্টের কালেই বরাহমিহির এবং এর পর প্রদুম্ন বিজয় নন্দী, সিংহাচার্য,

ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতেরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

জ্যোতিষবিদ্যার মত শুল্ব বা জ্যামিতিবিদ্যাও যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। যজ্ঞের জন্য বর্গ, আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ঋজুরেখ, কম্বস, বৃত্ত, উপবৃত্ত প্রভৃতি প্রয়োজন হত। সাধারণের বিশ্বাস গ্রীক পিথাগোরাস এই সব তথ্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু গ্রীক গণিতশাস্ত্রের ঐতিহাসিক হিথ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু বৌধায়ন শুল্ব সূত্রে এই তথ্য প্রতিপাদিত হয়েছে এবং বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ও শতপথ ব্রাহ্মণে এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে মনে করেন তৈত্তরীয় সংহিতার রচনাকালেই এসব আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব হিন্দুদের প্রাপ্য।

জ্যোতিষ ও জ্যামিতি প্রসঙ্গের পরই আয়ুর্বেদ চর্চায় বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়টি স্পষ্ট। ত্রিদোষ তত্ত্বের ওপর আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক যুগেই এর আবির্ভাব। অথর্ব সংহিতার বিভিন্ন অধ্যায়ে ভেষজ (medicine), শল্য (surgery) ও স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পরবর্তী কালে আয়ুর্বেদ স্বতন্ত্র বিদ্যা রূপে পরিগণিত হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন আরব জাতি প্রাচীন ভারত থেকেই এই বিদ্যা ইউরোপে প্রসারিত করে দেয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা প্রসিদ্ধ।

আয়ুর্বেদের সঙ্গে গভীর ভাব সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে রসায়ন। এই রসায়ন বিদ্যায় গ্রীসের বহু পূর্বেই যে ভারত অগ্রসর ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ইউরোপে প্যারাসেলসাস্ সর্বপ্রথম খাওয়ার ওষুধের জন্য পারদ ব্যবহার করতেন, কিন্তু এর হাজার বছর আগে ভারতে পারদ ও লোহার রাসায়নিক গবেষণা হয় এবং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই সময় আর্সেনিকের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। সুশ্রুত ক্ষার (alkali)-এর ব্যবহার করেন। নাগার্জুন যা লিখেছেন ইউরোপে একাদশ শতাব্দীর আগে তা জানা ছিল না। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভস্মীকরণ (calcination), অধঃপতন (distillation), স্বেদন (steam distillation), স্তম্ভন (fixation), ঊর্দ্ধপাতন (sublimation) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে ভারতের বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা ছিল সুপ্রচুর।

আয়ুর্বেদ রসায়নের সঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যার সম্পর্ক সুগভীর। প্রাচীনকালে উদ্ভিদবিদ্যার নাম তাই ছিল ভেষজবিদ্যা। বৃক্ষায়ুর্বেদ-এর আর এক নাম। এর অর্থ বৃক্ষের আয়ু সম্পর্কে জ্ঞান। অর্থশাস্ত্র, বৃহৎ-সংহিতা, অগ্নিপুরাণ -এইসব গ্রন্থে বীজ সংগ্রহ, নির্বাচন, ক্ষেত্র নির্বাচন, অঙ্কুরোদ্গম, কলমকাটা, শষ্যবপন, উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। তৈত্তরীয় ও বজ্রসেনীয় সংহিতায় উদ্ভিদের দু টি প্রধান অংশ মূল ও তুলের (shoot) এর উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। তুলের বিভিন্ন অংশ কাণ্ড (stem) বৎস (branch) পুষ্প ও ফলের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া বৃক্ষস্কন্ধ (trunk) শাখা ও পর্ণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে আম্রবৃক্ষের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

যে পদার্থবিজ্ঞানের সমুন্নতিতে বিশ্ব-সভ্যতা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন সেই পদার্থবিদ্যায় ভারত যে কতখানি অগ্রসর ছিল কণাদের পরমাণুবাদ তার সাক্ষ্য বহন করছে। ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের কাছে বিশ্ববাসী কৃতজ্ঞ – প্রমাণ 'অ্যাটম' কথাটিই তার কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু স্মরণে রাখা দরকার সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষেও পরমাণুবাদ নিয়ে চিন্তা করা হয়েছিল এবং সেগুলি গ্রীক দার্শনিকদের মতো অসংলগ্ন বা সংক্ষিপ্ত নয়, যথেষ্ট সমাঞ্জস্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত। ভারতীয় পরমাণুবাদের যা কিছু সবই আছে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে; পরে বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের অঙ্গীভূত হয়েছে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা অনেকেই এই সব দর্শন পাঠ করে বিজ্ঞানের অমূল্য তথ্যাদি উদ্ঘাটনে আগ্রহী না হওয়ার ফলেই প্রাচীন ভারতের

বিজ্ঞান-চিন্তা বিশ্বের কাছে রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত।

তারিখ সন নিয়ে বিবাদ করা যেসব পণ্ডিতদের কাজ তাঁরাও স্থির করতে পারেননি যে গ্রীক পরমাণুবাদ ও হিন্দু পরমাণুবাদের মধ্যে কোন্‌টি আগে। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এম্পিডক্‌লেসের (জন্ম খ্রীঃ পূঃ ৪১৯) রচনায় সর্বপ্রথম পদার্থের চারটি মৌলিক উপাদানের উল্লেখ দেখা যায়। এদিকে বৈশেষিক ও ন্যায়সূত্রের বয়স অনুমান করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। বলা যায়, একই সময়ে গ্রীক ও প্রাচীন ভারতে একই ধরণের চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিল। তবে এই দুই মতবাদের মধ্যে অমিলও যথেষ্ট। কণিকা সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম কণিকার নাম দেন তন্মাত্র। এগুলি পরমাণু থেকেও ক্ষুদ্র, এগুলি দিয়েই পরমাণু গঠিত। সাংখ্যের পরমাণুবাদের সঙ্গে মিল দেখা যায় গ্রীক দার্শনিক এম্পিডক্‌লেসের মৌলিক পদার্থবাদের। ভারতীয় পরমাণুবাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা মনীষী কণাদ। তাঁর মতে পরমাণু চার রকমের - ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু। আলো ও তাপ সম্পর্কে কণাদ আশ্চর্য আধুনিক উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন এদুটি হল তেজের দুই রূপ। তিনি পরমাণু যে চিরন্তন এবং এরা যে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে না সে সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। জৈন দর্শনে তো রাসায়নিক সমন্বয়ের কথাই বলা হয়েছে।

আধুনিক কালের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চিন্তা ও গবেষণার বিস্তৃত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-চিন্তার পর্যালোচনা করলে তাকে সংকুচিতই মনে হবে। কারণ প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের এই সব চিন্তার বহু তথ্যই আধুনিক বিজ্ঞান প্রামাণিক সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেও প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরা সেই সব তত্ত্ব বা তথ্যের পরীক্ষামূলক কোন প্রমাণ উপস্থিত না করায় সেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অপাংক্তেয়ই রয়ে গেছে। তাই আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চিন্তার অনাবিষ্কৃত নানা তত্ত্ব ও তথ্যের সার্থক উপস্থাপন হয়ে পড়েছে অত্যন্ত জরুরী। তা নইলে অসাধারণ সম্পদের অধিকারী হয়েও প্রাচীন ভারত বিশ্বের কাছে বিজ্ঞানচিন্তায় অনগ্রসর রূপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সেটা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যের।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিজ্ঞান

ড. মৃণাল কান্তি দাস

রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের ডালি সাজিয়ে অনন্ত লীলাময়ী, পরমাসুন্দরী প্রকৃতি কেবলই হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে মানুষের মনকে। কবির ভাষায় :

"তপতী কুমারী মরু আজ চাহে
প্রথম পায়ের ধূলি –
অজনা নদীর উৎস ডাকিছে
ঘোমটা আধেক খুলি।"

প্রকৃতই 'আধেক ঘোমটা খোলা' এই বিচিত্র সুন্দর প্রকৃতির আহ্বান শুনে মানুষের মন হয়েছে চিরচঞ্চল। তাইতো মানুষ কখনও মরুর তপ্ত বুকে পদচারণা করেছে, দুর্গম পাহাড়ের বুকে অভিযান চালিয়েছে, গভীর অরণ্যের ঘনান্ধকারে অনুপ্রবেশ করেছে অজানাকে জানার, অজানাকে চেনার আগ্রহে। এমনিভাবেই মানুষ সেই সুদূর অতীত থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানাভাবে রহস্যময়ী প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে হয়েছে আগ্রহী। এই আগ্রহের ফলশ্রুতি রূপেই মানব সভ্যতা পেয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে, পেয়েছে বিজ্ঞানকে পেয়েছে আরও নানান সম্পদ। আর সবকিছুর সমন্বয়েই তো সৃষ্ট হয়েছে মানব জীবনের সার্থকতা। মানব সভ্যতা পেয়েছে সম্পূর্ণতা। মানব সভ্যতার চিরকালীন সম্পদ সাহিত্য ও বিজ্ঞান তাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, একের সঙ্গে অপরের যোগে সুসম্পূর্ণ।

বিজ্ঞানের বিষয় হল জ্ঞান আর সাহিত্যের বিষয় হল মিলন। বিজ্ঞানের চরম আশ্রয় বিশিষ্ট জ্ঞান, আর সাহিত্যের পরম প্রাপ্তি সহিতত্ত্ব বা মিলন। বিজ্ঞানের রাজত্বে মূলতঃ জ্ঞানের প্রাধান্য, কিন্তু সাহিত্যের রাজত্বে প্রধানতঃ ভাবের আধিপত্য। জ্ঞানের সোপান বেয়ে আমাদের বিজ্ঞানের জগতে উপস্থিতি আর আনন্দের পথ বেয়ে আমাদের সাহিত্যের জগতে উত্তরণ। বিজ্ঞানের দৃষ্টি বিশ্লেষণের, সাহিত্যের দৃষ্টি সংশ্লেষণের। পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞানের স্রষ্টা; সমগ্র মানুষ সাহিত্যের স্রষ্টা। বিজ্ঞানের সত্য একবার জানলেই চিরকালের জন্য জানা হয়ে যায়, সাহিত্যের সত্য বারবার জেনেও সাধ মেটে না। তাই সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এসত্য একবার জানা হয়ে গেলে আর জানার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য তা চিরকালীন হয়েও চিরনতুন। তাই বারবার দেখেও তা দেখার আশ মেটে না। তা আমাদের কাছে চির অম্লান।

সাহিত্যের সৃজনে বিজ্ঞানের সাহচর্য চিরকাল পরিলক্ষিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জগৎ এক নয়। দুই-এরই বিচরণের ক্ষেত্র বিভিন্ন। কিন্তু তবুও এরা পরস্পরের কাছে অচ্ছ্যুৎ নয়। তাই বিজ্ঞানের জগতে যেমন সাহিত্যের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি লক্ষ্য করা যায় সাহিত্যের দরবারে বিজ্ঞানের উপস্থিতি। সাহিত্যের রূপাঙ্গিক নির্বাচনে ও শিল্পসুষমার বিকাশ সাধনে বিজ্ঞানের ভূমিকা নগণ্য নয়। সাহিত্যের আলোচনার সীমা নির্ধারণ অনেকখানি পরিমাণে বিজ্ঞান আলোচনারই অনুসারী। কাব্যের ছন্দ প্রকরণে, মহাকাব্যের নিয়মনিয়ন্ত্রণে, নাটকের স্থানকাল নির্ভর অঙ্ক দৃশ্য বিভাজনে, সঙ্গীতের তাল-লয়-মাত্রা নির্ধারণে বিজ্ঞানের সহায়তা অস্বীকার করা সহজ নয়। এমনকি একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে তত্ত্ব বা তথ্যবহুল সাহিত্য, যার আবেদন আমাদের বোধ অপেক্ষা বুদ্ধির কাছে, আমাদের হৃদয় অপেক্ষা মস্তিষ্কের কাছে, তা মূলতঃ বিজ্ঞানেরই ভিন্ন রূপ।

সাহিত্য হয় রসমন্ডিত অন্যদিকে বিজ্ঞানে সত্য হয় রমণীয়। নিরাবরণ ও নিরাভরণ ভাবে বিজ্ঞানের শুষ্ক সত্যটুকু প্রকাশ করলে বিজ্ঞানীর পরিতৃপ্তি ঘটে, কিন্তু কৌতুহলী সাধারণ মানুষ পরমানন্দ পায় না। বিজ্ঞানের রসকষহীন সত্যকে সাহিত্য রসসিক্ত করে প্রকাশ করলে মানুষের কাছে তা হয়ে ওঠে পরম সম্পদ। রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত জল বাষ্পাকারে সৃষ্টি করে মেঘ বা বৃষ্টিপাতের কারণ – বিজ্ঞানের এই নির্ভুল সত্যটি মানুষকে যতটুকু আকর্ষণ করে, তার চাইতে অনেক বেশী আকর্ষণ করে কবির ভাষা :

"I am the daughter of Earth and water
And nursling of the sky;
I pass through the pores of the ocean and shores!
I change but I can not die,"

বলা বাহুল্য, কবির এই ভাষায় বিজ্ঞানের সত্যই পেয়েছে এক রমণীয় রূপ।

আদিম মানুষ আগে পেয়েছে বিজ্ঞান পরে সাহিত্যকে। মানব-সভ্যতার অক্ষয় সম্পদ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস কিন্তু স্বল্পদিনের নয়। ভয়ঙ্করী প্রকৃতির বুকে মানব কিন্তু প্রথমে অসহায় রূপে উপস্থিত হলেও সে ক্রমে নিজের অসহায়তা কাটিয়ে উঠেছে। যেদিন আদিম মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল, সেই দিনই নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বরণ করে নিল বিজ্ঞানের পথ। বিজ্ঞানের পথে শুরু হল মানব অভিযাত্রীর জয়যাত্রা। তখনও পর্যন্ত কিন্তু সাহিত্যের সান্নিধ্য লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি, কেননা সেই যুগ ছিল প্রতীক সংকেত ও চিত্রের যুগ। এই যুগের সমাপ্তি পর্বে যখন মানুষ পেল ভাষার আশ্রয়, বিশেষত লেখ্য ভাষার আশ্রয় তখনই উন্মুক্ত হয়ে গেল এক অজানা জগতের রুদ্ধ দ্বার। সেই জগৎ - সাহিত্যের। এই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেই মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে ও তাকে স্থায়ী করে রাখতে আগ্রহী। ফলে রচিত হয়েছে সাহিত্য, রচিত হয়েছে সংস্কৃতি। এরপর কালের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও সাহিত্য শৈশবত্ব ও বালকত্বের পালা অতিক্রম করে পৌঁছেছে যৌবনের পূর্ণতায়। এ চলার আজও শেষ নাই।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মূলে অবাধবোধ ক্রিয়াশীল। যে বিশেষ ধরণের অতৃপ্তির ফলে বিজ্ঞানী অনলস সাধনায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে সৃষ্টির রহস্যের এক একটি আবরণ উন্মোচন করে চলেছেন, সেই বিশেষ ধরণের অভাববোধ থেকেই জন্ম নিচ্ছে মানুষের সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মানুষের মানস জগতে যখন দেখা দেয় কোন আলোড়ন, তখন তারই সার্থক সমাধান সন্ধানে অগ্রসর হয় বিজ্ঞান। এমনিভাবেই সাহিত্যিকের মনে উত্থিত প্রশ্নের সমাধান দেয় বিজ্ঞান তার বিচার ও বীক্ষণ শক্তির মাধ্যমে।

বিজ্ঞানের জগৎ প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ, সাহিত্যের জগৎ অনন্ত। বিজ্ঞানের জগৎ প্রধানতঃ প্রয়োজনের জগৎ - এর সীমানা তাই সংকীর্ণ; কিন্তু সাহিত্যের জগৎ প্রয়োজনের সীমায় সীমিত নয় বলে এর ব্যাপ্তি তাই অনন্ত-প্রসারিত। সাহিত্যের এই সীমাহীন জগতে চিরকালই ঘটেছে মানুষের আত্মপ্রকাশ। সাহিত্য মানুষের আত্মবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র। সাহিত্যের প্রসারিত ক্ষেত্রে মানুষের আত্মবিকাশ অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। ফলে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের হয়েছে সার্থক মিতালী। সাহিত্যের দাবী চিরকাল মানুষের হৃদয়ে। সাহিত্যিক তাই বিজ্ঞানের তথ্যে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেন এমন মধুচক্র যেখানে অসংখ্য পাঠক উপস্থিত হয়ে রসাস্বাদনে হয় রত। রবীন্দ্র সাহিত্য এমনই এক মধুচক্র যেখানে সৃষ্টির অনেক পর্বেই বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য সাহিত্যের সুন্দরাবরণে হয়ে উঠেছে অপূর্ব আস্বাদ্য।

রবীন্দ্র কবি জীবন বিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র কবিজীবন বারবার হয়েছে বিজ্ঞান প্রভাবিত। শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রীতি হয়ে উঠেছিল প্রবল, পরিণত বয়সে তা বৃদ্ধি পায় এবং জীবন সায়াহ্নে তা হয়ে ওঠে তীব্রতর। এই নিরিখে বিচার করলে রবীন্দ্র-জীবন-পরিচিতি তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। আর এই তিনটি পর্বে রচিত সাহিত্যেই বিজ্ঞানের সত্য সার্থক সুন্দর সাহিত্য-সৌন্দর্য লাভে হয়ে উঠেছে অনন্য। প্রকৃতপক্ষে, কবি রবীন্দ্রনাথের ছিল এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। তাই কাব্যরসের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তাঁকে প্লাবিত করতে পারেনি। বরং সুস্থ স্বাভাবিকপথে চালনা করে তাঁকে এক রসোত্তীর্ণ জগতে পৌঁছে দিয়েছে তাঁর বিজ্ঞান-রসিক সত্তা। বিজ্ঞানকে জানা তাঁর কাছে বিলাসিতা ছিল না, ছিল শ্লাঘার বিষয়। তিনি লিখেছেন, 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।' তাই বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কবির সৃষ্ট বিরাট সাহিত্য জগতে বিজ্ঞানের প্রবেশ হয়েছে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্য। কবি তাই কবিতার কল্পলোক থেকে এসেছেন বারবার জড়জগতের প্রান্তসীমায়, তারই সার্থক ফলশ্রুতি দীর্ঘ জীবন ব্যাপী সৃষ্ট অজস্র কবিতাগুচ্ছের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপুল বিন্যাস। এরই প্রমাণ আছে 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতায়। সৃষ্টির রহস্য তিনি খুঁজেছেন বিজ্ঞানের পুঁথির মধ্যে, পুরাণের কল্পলোকে। তিনি লিখেছেন,

"থেমে এল প্রচন্ড কল্লোল
নিভে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস
গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিভাইল নিজের হুতাশ।"

এই পংক্তিগুলি নিঃসন্দেহে বহন করছে বিজ্ঞানের সত্য সহজ স্বচ্ছন্দ্যে। এই কবিতারই আর এক অংশে কবি লিখলেন,

"চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে"

– উদ্ধৃতিটির মধ্যে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সত্যেরই স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কবি য ১৭৯৬ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞানী লাপ্লাসের নীহারিকা তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন এ পংক্তিগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

ডার্‌উইনের অভিব্যক্তিবাদ তাঁর রচনায় যে কি অসাধারণ কাব্যরূপ লাভ করেছে তার প্রমাণ আছে 'বলাকা'-র কবিতাগুলিতে। কবি যখন বলেছেন –

"প্রাচীনকালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী
পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিনী
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমারি স্মৃতি।"

তখন এর মধ্যে আমরা ডারউইনের মতবাদেরই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি।

অভিব্যক্তিবাদের সম্পর্কে কবি লিখেছেন। 'অভিব্যক্তিবাদ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে ? না, কিছুই আকাশ হইতে পড়িয়া হয় না, প্রকৃতিতে কিছুরই হঠাৎ মাঝখানে আরম্ভ নাই।' এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি আছে 'বসুন্ধরা' কবিতায় কিংবা 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় কবি লিখেছেন –

"আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,

শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার –”

এমনিভাবেই কবি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিরসঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার উজার করে এমনি অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের সাহিত্যরসসিক্ত সার্থক প্রকাশের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করা সহজ সাধ্য নয়। পণ্ডিতেরা এ কাজ যত্ন সহকারে সম্পন্ন করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে যে কথাটি উচ্চারণ করে বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করা যায় তা হল : বিজ্ঞানের কারবার যে সত্যকে নিয়ে তা জ্ঞানের বিষয় আর সাহিত্যের কারবার যে সত্যকে নিয়ে তা আনন্দের বিষয়। তাই এই জগৎকে সত্যের মাধ্যমে, জ্ঞানের মাধ্যমে ও আনন্দের মাধ্যমে জানতে পারলে তবেই জানা হয় সার্থক। সত্য-শিব সুন্দরের সমন্বয়েই প্রতিষ্ঠা পায় পূর্ণতা।